فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۭ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۴۵

(৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টি-শক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। (৪৪) আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নগণের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে,; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু করতে সক্ষম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তোমার কি (প্রমাণাদি ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা) জানা নেই যে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে? (উক্তি-গতভাবে হোক, যেমন কোন কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা পরিদৃষ্টও হয় অথবা অবস্থা-গতভাবে হোক, যেমন সব সৃষ্ট জীবের মধ্যে তা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা আছে) এবং বিশেষভাবে পক্ষীকুল (ও), যারা পাখা বিস্তার করে (উড্ডীয়মান) আছে। (তারা আরও আশ্চর্যজনকভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বোঝায় তাদের দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তারা শূন্যে অবস্থান করে) প্রত্যেকেরই (অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষীরই) নিজ নিজ দোয়া (এবং আল্লাহ্‌র কাছে অনুনয়-বিনয়) এবং তসবীহ (ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি ইল-হাম দ্বারা) জানা আছে (এসব প্রমাণ জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ তওহীদ স্বীকার করে না। অতএব) তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত আছেন। (এই অমান্যতার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেবেন) আল্লাহ্ তা'আলারই রাজত্ব নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে (এখনও) এবং (পরিশেষে) আল্লাহ্‌র দিকেই (সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তখনও

সর্বময় বিচার-ক্ষমতা তাঁরই হবে। সে মতে রাজত্বের একটি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হচ্ছে হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (একটি) মেঘখণ্ডকে (অন্য মেঘখণ্ডের দিকে) সঞ্চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘখণ্ডকে (অর্থাৎ তার সমষ্টিকে) পরস্পরে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, অতঃপর তুমি দেখ যে, তার (মেঘমালার) মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি মেঘমালা থেকে অর্থাৎ তার বিরাট স্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যাকে (অর্থাৎ যার প্রাণ অথবা মালকে) ইচ্ছা আঘাত করেন (ফলে তার ক্ষতি হয়ে যায়) এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে নেন (এবং তার জান ও মালকে বাঁচিয়ে দেন। সেই মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎও সৃষ্টি হয়, এমন চোখ ঝলসানো যে) তার বিদ্যুৎঝলক যেন দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায় (এটাও আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম ক্ষমতা)। আল্লাহ্ তা'আলা দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান (এটাও তাঁর অন্যতম ক্ষমতা)। এতে (অর্থাৎ এর সমষ্টি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য প্রমাণ আছে। (যদ্দ্বারা তাওহীদ ও لله ملك السموات والارض এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করে। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতা যে) আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে (স্থলের হোক কিংবা জলের) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে (যেমন সর্প, মাছ), কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন মানুষ ও উপবিষ্ট পাখী) এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন চতুষ্পদ জন্তু। এমনিভাবে কতক আরো বেশির ওপরও ভর দিয়ে চলে। আসল কথা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান (তাঁর জন্য কিছুই কঠিন নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ——আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমিন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে—এর চুল পরিমাণও বিরোধিত করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত—উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

যামাখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে তার স্রষ্টা

ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ্ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ——এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্ট জগত ব্যাপৃত আছে; কিন্তু প্রত্যেকের নামায ও তসবীহ্ পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ্ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়-বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পূর্ণ করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কৌশল অবলম্বন করে!

مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا——এখানে سماء মানে মেঘমালা এবং جبال মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। برد—এর অর্থ শিলা।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ وَاِنْ يَّكُنْ
لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝ اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا
اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۭ بَلْ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ۝ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝
وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَىِٕنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۭ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ
طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ
وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۭ
وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۭ وَمَا عَلَي الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

(৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলেঃ আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসূলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে রোগ আছে, না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী। (৫১) মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকামী। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তাঁরা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুনঃ তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত। (৫৪) বলুনঃ আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে ন্যও, তবে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সত্যকে) বোঝানোর প্রমাণাদি (ব্যাপক হিদায়তের জন্য) অবতীর্ণ করেছি। সাধারণের মধ্য হতে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎ পথের দিকে (বিশেষ) হিদায়ত করেন।

(ফলে সে আল্লাহ্‌র জ্ঞাতব্য হক অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং কার্যগত হক অর্থাৎ ইবাদত পালন করে। নতুবা অনেকেই বঞ্চিত থাকে।) মুনাফিকরা (মুখে) দাবি করে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং (আল্লাহ্ ও রসূলে) আদেশ (মনে-প্রাণে) মানি। এরপর (যখন কর্মের মাধ্যমে দাবি প্রমাণের সময় আসল, তখন) তাদের একদল (যারা খুবই পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় [অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কারও প্রাপ্য পরিশোধযোগ্য হয় এবং প্রাপক সেই মুনাফিককে বলে যে, চল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বিচার নিয়ে যাই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা, সে জানে যে, তাঁর এজলাসে হক প্রমাণিত হলে তিনি তার পক্ষেই ফয়সালা দেবেন। পরবর্তী وَاِذَا دُعُوْا আয়াতে এর এরূপ বর্ণনাই উল্লিখিত হয়েছে। সকল মুনাফিকই এরূপ ছিল, এতদসত্ত্বেও বিশেষভাবে এক দলের কথা বলার কারণ এই যে, গরীব মুনাফিকরা আন্তরিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিষ্কার অস্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারত না। যারা প্রভাবশালী ও শক্তিমান, তারাই এ কাজ করত] তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (অর্থাৎ কোন মুনাফিকের অন্তরেই ঈমান নেই; কিন্তু তাদের বাহ্যিক কৃত্রিম ঈমানও নেই; যেমন এক আয়াতে আছে, وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ অন্য এক আয়াতে আছে قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ তাদের এই আদেশ লংঘনের বর্ণনা এই যে) তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, যাতে রসূল তাদের (ও তাদের প্রতিপক্ষের) মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল (সেখানে যেতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং তালবাহানা করে। এই আহ্বান রসূলের দিকেই করা হয়; কিন্তু রসূল যেহেতু আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, তাই আল্লাহ্‌র দিকেও আহ্বান করা হয় বলা হয়েছে। মোট-কথা, তাদের কাছে কারও হক প্রাপ্য হলে তারা এরূপ করে) আর যদি (ঘটনাক্রমে) তাদের হক এক (অন্যের কাছে) থাকে, তবে তারা বিনয়াবনত হয়ে (নির্দ্বিধায় তাঁর ডাকে তাঁর কাছে ছুটে আসে। কারণ, তারা নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফয়সালা হবে। এতে তাদের উপকার হবে। অতঃপর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও উপস্থিত না হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করে সবগুলোকে বাতিল ও একটিকে সপ্রমাণ করা হয়েছে)। কি (এই মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এই যে) তাদের অন্তরে (নিশ্চিত কুফরের) রোগ আছে (অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল নন) না তারা (নবুয়তের ব্যাপারে) সন্দেহে পতিত আছে, (অর্থাৎ রসূল না হওয়ার বিশ্বাস তো নেই; কিন্তু রসূল হওয়ারও বিশ্বাস নেই) না তারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন (এবং তাদের কাছে যে হক প্রাপ্য, তার চাইতে বেশি দিতে বলবেন। বাস্তব ঘটনা এই যে, এগুলোর মধ্যে একটিও কারণ নয়) বরং (আসল কারণ এই যে) তারাই (এসব

মোকদ্দমায়) অন্যায়কারী। (তাই রসূলের দরবারে মোকদ্দমা আনতে রাজী হয় না। এছাড়া পূর্ববর্তী সব কারণ অনুপস্থিত)। মুসলমানদের (অবস্থাও তাদের) উক্তি যে যখন তাদের (কোন মোকদ্দমায়) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো (হৃষ্টচিত্তে) একথাই বলেঃ আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং মেনে নিলাম। (এরপর তৎক্ষণাৎ চলে যায়। এটা এরই আলামত, যে তাদের سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বলা দুনিয়াতেও সত্য।) তারাই (পরকালেও) সফলকাম। (আমার নিকট তো সামগ্রিক নীতি এই যে) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ মান্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম হবে। (এটাও মুনাফিকদের অবস্থা যে) তারা দৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, (আমরা এমন অনুগত যে) যদি আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ আমাদেরকে) আদেশ করেন (যে, বাড়িঘর ছেড়ে দাও) তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) এখনি (সব ত্যাগ করে) বের হব। আপনি বলে দিনঃ তোমরা কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানা আছে। (কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমারে কাজকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। (তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন; যেমন অন্যত্র আছে قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ (কথায় লাভ হবে না, কাজ কর। অর্থাৎ) আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্বদানের জন্য স্বয়ং তাদেরকে সম্বোধন করেন যে, রসূলের এই আদেশ ও প্রচারের পর) পুনরায় যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখ (যে, এতে রসূলের কোন ক্ষতি নেই; কেননা) রসূলের দায়িত্ব প্রচার, যা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (তিনি তা সম্পন্ন করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন) এবং তোমাদের দায়িত্ব তা (অর্থাৎ আনুগত্য করা) যা তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। (তোমরা তা পালন করনি। সুতরাং ক্ষতি তোমাদেরই হবে) যদি (মুখ না ফিরাও, বরং) তাঁর আনুগত্য কর (যা আল্লাহ্রই আনুগত্য) তবে সৎ পথ পাবে। (মোটকথা) রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া (এরপর কবুল করলে কিনা তা তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে যমীন সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বললঃ চল, তোমাদেরই রসূল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এজলাসে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে

যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতীর্ণ হয়।

সাফল্য লাভের চারটি শর্ত ঃ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ—এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ তফসীরে-কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ফারূকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে ওঠে। হযরত ফারূকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রূমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ—হযরত ফারূকে আযম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ব্যাপার কি? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারূক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর কোন কারণ আছে কি? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমি তওরাত, ইনজীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত। ফারূকে আযম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আয়াতটি কি? রূমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তিলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তফসীরও বর্ণনা করল যে, مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ আল্লাহ্র ফরয কার্যাদির সাথে, وَرَسُوْلَهٗ রসূলের সুন্নতের সাথে, وَيَخْشَ اللّٰهَ অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ—এর সুসংবাদ দেয়া হবে। فَائِز তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারূকে আযম একথা শুনে বললেন ঃ রসূলে করীম (সা)-এর

কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ اوتيت جوا مع الكلم অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত।----(কুরতুবী)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ
الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۭ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا
يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـــًٔا ۭ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ
وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (৫৬) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (৫৭) তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কত নিকৃষ্ট না এই প্রত্যাবর্তনস্থল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সফল উম্মত) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত নূরে-হিদায়তের পুরোপুরি অনুসরণ করে।) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদেরকে (এই অনুসরণের কল্যাণে) পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী (হিদায়ত প্রাপ্ত) লোকদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। (উদাহরণত বনী-ইসরাঈলকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবতীদের ওপর প্রবল

করেছিলেন। এরপর শাম দেশে আমালেকার ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতির ওপর তাদেরকে আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও শাম দেশের শাসন কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী করেছিলেন)। আর (এই রাজত্ব দান করার উদ্দেশ্য এই যে) তিনি যে ধর্মকে তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ ইসলাম; যেমন অন্য আয়াতে আছে رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) তাকে তাদের (পরকালীন উপকারের) জন্য শক্তিশালী করবেন এবং (শত্রুদের তরফ থেকে তাদের যে স্বাভাবিক ভয়ভীতি) তাদের ভয়ভীতির পর তাদেরকে শান্তি দান করবেন এই শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। (প্রকাশ্যও নয়, অপ্রকাশ্যও নয়, যাকে রিয়া বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রতিশ্রুতি ধর্মের উপর পূর্ণরূপে কায়েম থাকার শর্তাধীন। এই প্রতিশ্রুতি তো দুনিয়ার জন্য। পরকালে ঈমান ও সৎ কর্মের কারণে যে মহান প্রতিদান ও চিরন্তন সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি আছে, সেটা ভিন্ন।) যে ব্যক্তি এরপর (অর্থাৎ এই প্রতিশ্রুতি জাহির হওয়ার পর) অকৃতজ্ঞ হবে, (অর্থাৎ ধর্মবিরোধী পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য এই প্রতিশ্রুতি নয়; কেননা) তারাই নাফরমান। (প্রতিশ্রুতি ছিল ফরমাবরদারদের জন্য। তাই তাদেরকে দুনিয়াতেও রাজত্ব দান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি এবং পরকালের শাস্তিও ভিন্ন হবে। হে মুসলমানগণ, তোমরা যখন ঈমান ও সৎ কর্মের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকারিতা শুনেছ, তখন তোমাদের উচিত যে) তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (অবশিষ্ট বিধানাবলীতেও) রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা হয়। (এরপর কুফর ও অবাধ্যতার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে সম্বোধিত ব্যক্তি) কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করো না যে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করবে এবং) আমাকে হারিয়ে দেবে (এবং আমার ক্রোধ থেকে বেঁচে যাবে। না, বরং তারা স্বয়ং হেরে যাবে এবং ক্রোধের শিকার ও পরাভূত হবে। এটা দুনিয়ার পরিণাম। পরকালে) তাদের ঠিকানা দোযখ। কত নিকৃষ্টই না এই ঠিকানা!

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযূল ঃ কুরতুবী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরিকদের আক্রমণের আশংকা বিদ্যমান ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব----এরূপ সময় কি কখনও আসবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এরূপ সময় অতি সত্বরই আসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ

অবতীর্ণ হয়।---(কুরতুবী, বাহর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উম্মতে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইনজীলে দিয়েছিলেন।----(বাহ্রে-মুহীত)

আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়ভীতি থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহ্রাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শ্যাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিরা কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা হন। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর ওসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেনঃ আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। (ইবনে কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। পর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শের ওপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খিলাফত হযরত আলী (রা) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে কাসীর এ স্থলে সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যামরা বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। ইবনে কাসীর বলেনঃ এই হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরী। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হযরত মাহদী। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরী নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের ওপর ভিত্তিশীল। এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোন ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ্ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কোরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ —অর্থাৎ আল্লাহ্র দলই প্রবল থাকবে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফায়ে-রাশেদীনের খিলাফত ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণঃ এই আয়াত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহ্র কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযীদের ধারণা তদ্রূপই; তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ্! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎ কর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে-রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে

বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহ্র ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎ কর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাম্ভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। .

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ — كَفَرَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালংঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই بَعْدَ ذٰلِكَ বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেনঃ

তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ্ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এইঃ

> যেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন, সেইদিন থেকে আল্লাহ্র ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হিফাযতে মশগুল আছে। যদি তোমরা ওসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ্র কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাযির হবে, তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহ্র তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহ্র কসম, যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।—(মাযহারী)

সেমতে হযরত উসমান গনীর হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত উসমানের হত্যাকারীরা খিলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খুলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। نسئل الله الهداية و شكر نعمته

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ
تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ
لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا
كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ
وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(৫৮) হে মু'মিনগণ, তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়; এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা

তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্য দোষ নেই তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (তোমাদের কাছে আসার জন্য) তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, (এক) ফজরের নামাযের পূর্বে, (দুই) দুপুরে যখন তোমরা (নিদ্রার জন্য অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখ এবং (তিন) এশার নামাযের পর। এই তিনটি সময় তোমাদের পর্দার সময় (অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই তিনটি সময় একান্তবাস ও বিশ্রাম গ্রহণের সময়। এতে মানুষ খোলাখুলি থাকতে চায়। একান্তে কোন সময় আবৃত অঙ্গও খুলে যায় অথবা প্রয়োজনে খোলা হয়। তাই নিজের দাসদাসী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদেরকে বোঝাও, যাতে বিনা খবরে ও বিনানুমতিতে এ সময়ে তোমাদের কাছে না আসে)। এ সময়গুলো ছাড়া (বিনানুমতিতে আসতে দেওয়ায় ও নিষেধ না করায়) তোমাদের কোন দোষ নেই। (কেননা) তোমাদেরকে একে অপরের কাছে তো বারংবার যাতায়াত করতেই হয়। (সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি চাওয়া কষ্টকর। যেহেতু এটা পর্দার সময় নয়, তাই আবৃত অঙ্গ গোপন রাখা কঠিন নয়।) এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন তোমাদের (অর্থাৎ মুক্তদের) বালকরা (যাদের বিধান উপরে বর্ণিত হয়েছে) বয়োপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সাবালক ও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়) তখন তারাও যেন (এমনিভাবে) অনুমতি গ্রহণ করে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা (অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠরা) অনুমতি গ্রহণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তাঁর বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (জানা উচিত যে, পর্দার বিধানের কঠোরতা, অনর্থের আশংকার ওপর ভিত্তিশীল। যেখানে স্বভাবগতভাবে অনর্থের সম্ভাবনা নেই; উদাহরণত) বৃদ্ধা নারী যারা (কারও সাথে) বিবাহের আশা রাখে না (অর্থাৎ আকর্ষণীয়া নয়—এটা বৃদ্ধা হওয়ার ব্যাখ্যা) এতে তাদের কোন গুনাহ্ নেই যে, নিজ (অতিরিক্ত) বস্ত্র (যদ্দ্বারা মুখ ইত্যাদি আবৃত থাকে এবং তা গায়র-মাহ্রামের সম্মুখেও খুলে রাখে, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রকাশ না করে; (যা মাহ্রাম নয়, তা এমন ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয; অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং কারও কারও মতে পদযুগলও। পক্ষান্তরে অনর্থের আশংকার কারণে যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ইত্যাদিরও পর্দা জরুরী। এবং (যদি বৃদ্ধা ও নারীদের জন্য মাহরাম নয় এমন ব্যক্তির সামনে মুখমণ্ডল খোলার অনুমতি আছে; কিন্তু এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম (কেননা, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পর্দাহীনতাকে উচ্ছেদ করা)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সূরা নূরের অধিকাংশ বিধান নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন করার উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে। এগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতেরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় নারীদের পর্দার বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

আত্মীয়স্বজন ও মাহ্‌রামদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশঃ সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে "অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী" শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী—সবার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহ্‌রাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়—মুস্তাহাব। এটা তরক করা মকরূহ্ তানযিহী। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছেঃ

فمن اراد الدخول فى بيت نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول فيه من غير استيذان تنزيها لاحتمال رؤية واحدة منهن عريانة وهو احتمال ضعيف مقتضاه التنزه -

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহ্‌রাম আত্মীয়স্বজন এমনকি, সমঝদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন

হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ---অর্থাৎ এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা শরীয়তের কোন আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই-এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভেতরে এসো না; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোর-ভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের ওপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের ওপর কোন جُنَاحٌ নেই। جُنَاحٌ শব্দটি সাধারণত গোনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لَا جُنَاحَ এর অর্থ তা-ই; অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গোনাহ্গার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল।---(বয়ানুল কোরআন)

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে মাহ্রাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

মাস'আলা ঃ এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব, না মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহ্বিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহ্-বিদের

মতে আয়াতটি মোহ্কাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব।—(কুরতুবী)। কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারও আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে-কাসীর ইবনে-আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তিনটি আয়াতের আমল লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত—يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ—এতে আত্মীয়-স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের-কেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ— —এতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃক্ষুণ্ন না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ—এতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মুত্তাকী। আজকাল যার কাছে পয়সা বেশি, যার বাংলো ও কুঠি সুরম্য ও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাসের ভাষা এরূপ ঃ তিনটি আয়াতের ব্যাপারে শয়তান মানুষকে পরাভূত করে রেখেছে। অবশেষে তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার দাসীকেও এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতীত আমার কাছে না আসতে বাধ্য করে রেখেছি।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসকে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে

প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন إن الله ستير يحب الستر ---অর্থাৎ আল্লাহ্ পর্দাশীল। তিনি পর্দার হিফাযত পছন্দ করেন। আসল কথা এই যে, এসব আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সামাজিক চালচলন অত্যন্ত সাদাসিধে ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন মাঝে মাঝে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাৎ এমন সময় গৃহে প্রবেশ করত যে, গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিপ্ত থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায় পর্দা আছে এবং গৃহমধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট---অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই।---(ইবনে কাসীর)। ইবনে আব্বাসের এই দ্বিতীয় রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, স্ত্রীর সাথে লিপ্ত থাকা, আবৃত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারও আগমনের সম্ভাবনা ইত্যাদি ঘটনার আশংকা না থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হতে পারে। কিন্তু কারও স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। যারা পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করে না, তারা স্বয়ং কষ্টে পতিত থাকে। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাঞ্ছিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বোধ করে।

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরও একটি ব্যতিক্রম ঃ ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যতিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহ্‌রাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারও কারও মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহ্‌রামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহ্‌রামদের কাছে যে সব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الاية ---এর তফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহ্‌রামের সামনে খোলা যায়---যে মাহ্‌রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যদি সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ---

—অর্থাৎ সে যদি মাহ্‌রাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরাপুরি বিরত থাকে, তবে তা তা'র জন্য উত্তম।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ
أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ
أَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيْقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا
أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْأٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

(৬১) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই, এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি তোমরা কোন অন্ধ, খঞ্জ ও রোগী অভাবীকে তোমাদের কোন স্বজন অথবা পরিচিতের গৃহে নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দাও অথবা নিজেরা পানাহার কর, এমতাবস্থায় সেই স্বজন তোমাদের খাওয়ানো ও খাওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট ও কষ্ট

অনুভব করবে না বলে নিশ্চিতরূপে জানা গেলে) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা (নিজেরা অথবা উপরোক্তদের সহ সবাই) নিজেদের গৃহে (এতে স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে) আহার করবে। অথবা (পরে উল্লিখিত গৃহসমূহে আহার করবে। অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের আহার করা ও উপরোক্ত বিকলাঙ্গদের আহার করার মধ্যে কোন গোনাহ্ নেই। এমনিভাবে তোমাদের খাওয়ানো ও তাদের খাওয়ার মধ্যে কোন গোনাহ্ নেই। গৃহগুলো এই ঃ) তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (এতেও) তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর (মনে রেখ যে) যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের (অর্থাৎ সেখানে যেসব মুসলমান থাকে, তাদের) প্রতি সালাম বলবে (যা) দোয়া হিসেবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং (সওয়াব পাওয়ার কারণে) কল্যাণময়, (এবং প্রতি পক্ষের মন সন্তুষ্ট করার কারণে) উত্তম কাজ। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজের) বিধানাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বোঝ (এবং পালন কর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিকতার রীতিনীতি ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের হিফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রসূলের সংসর্গে থাকার জন্য এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশের প্রতি উৎসর্গ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র সংসর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাঁদের জন্য ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ভীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল

সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযুল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযুল। ঘটনাবলী নিম্নরূপ ঃ

(১) ইমাম বগভী তফসীরবিদ সাঈদ-ইবনে জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি না খায় এবং সবাই সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দুই জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

(২) বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ —(অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না) আয়াতটি নাযিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ন ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোন্‌টি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশী খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশী হওয়ার চিন্তা করো না।

(৩) সাঈদ ইবনে-মুসাইয়্যিব বলেন ঃ মুসলমানগণ জিহাদে যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু

আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মসনদে বাযযারে হযরত আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশংকা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের أَوْ صَدِيقِكُمْ (অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই) শব্দটি হারিস-ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক জিহাদে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়দের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়দ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। ——(মাযহারী) বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাস'আলা: পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়ের মতে লৌকিকতার বালাই ছিল না। একে অপরের গৃহে কিছু খেলে গৃহকর্তা মোটেই কষ্ট ও পীড়া অনুভব করত না; বরং এতে সে আনন্দিত হত। এমনিভাবে আত্মীয় যদি নিজের সাথে কোন বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ও মিসকীনকেও খাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করত না। এসব বিষয়ের স্পষ্টত অনুমতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, যেকালে অথবা যেস্থানে এরূপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহযুক্ত হয়, সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম, যেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না যে, কোন আত্মীয় তার গৃহে যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করাবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েয নয়। তবে যদি কোন বন্ধু ও স্বজন সম্পর্কে কেউ নিশ্চিতরূপে জানে যে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার করালে কষ্ট কিংবা অস্বস্তি বোধ করবে না, বরং আনন্দিত হবে, তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েয।

মাস'আলা: উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে——এ কথা বলা ঠিক নয়। বরং বিধানটি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এর জন্য

শর্ত। এরূপ অনুমতি না থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার করা জায়েয নয়।—(মাযহারী)

মাস'আলা ঃ এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে বর্ণিত বিশেষ আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর অনুমতি আছে, এতে সে আনন্দিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে তার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য।—(মাযহারী) কারও গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েয অথবা মুস্তাহাব, উল্লিখিত বিধান সেসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কাজের মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ্ হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ
عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ
شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم
بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ
مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

(৬২) মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্য অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান! (৬৩) রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা আল্লাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুসলমান তো তারাই, যারা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং রসূলের কাছে যখন কোন সমষ্টিগত কাজের জন্য একত্রিত হয় (এবং ঘটনাক্রমে সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়) তখন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত (এবং তিনি অনুমতি না দিলে সভাস্থল থেকে ওঠে) চলে যায় না। (হে রসূল) যারা আপনার কাছে (এরূপ স্থলে) অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে। (অতঃপর তাদেরকে অনুমতি দানের কথা বলা হচ্ছে ঃ) অতএব তারা (বিশ্বাসীরা এরূপস্থলে) তাদের কোন কাজের জন্যে আপনার কাছে (চলে যাওয়ার) অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য (উপযুক্ত মনে করেন এবং অনুমতি দিতে) চান, অনুমতি দিন। (এবং যার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন না, তাকে অনুমতি দেবেন না। কেননা, অনুমতি প্রার্থী হয় তো তার কাজটিকে খুব জরুরী মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তা জরুরী নয়, অথবা জরুরী হলেও তার চলে যাওয়ার কারণে তদপেক্ষা বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার ফয়সালা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে) এবং অনুমতি দিয়েও তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। (কেননা, তাদের এই বিদায় প্রার্থনা শক্ত ওযরের কারণে হলেও এতে দুনিয়াকে দীনের ওপর অগ্রগণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা এক প্রকার ত্রুটি। এর জন্য আপনার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের দোয়া করা দরকার। দ্বিতীয়ত এটাও সম্ভব যে, অনুমতিপ্রার্থী যে ওযর ও প্রয়োজনকে শক্ত মনে করে অনুমতি নিয়েছে, তাতে সে ইজতিহাদগত ভুল করেছে। এই ইজতিহাদী ভুল সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারত। এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা না করা একটি ত্রুটি। ফলে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন আছে)। নিশ্চয়

আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাদের নিয়ত ভাল ছিল, তাই এ ধরনের সূক্ষ্ম ব্যাপারাদিতে তিনি ধরপাকড় করেন না)। তোমরা রসূলের আহবানকে (যখন তিনি কোন ইসলামী প্রয়োজনে তোমাদেরকে একত্রিত করেন) এরূপ (সাধারণ আহবান) মনে করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে আহবান কর (যে আসলে আসল, না আসলে না আসল। এসেও যতক্ষণ ইচ্ছা বসল, যখন ইচ্ছা উঠে চলে গেল। রসূলের আহবান এরূপ নয়; বরং তাঁর আদেশ পালন করা ওয়াজিব এবং অনুমতি ছাড়াই চলে যাওয়া হারাম। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া চলে যায়, তবে রসূলের তা অজানা থাকতে পারে; কিন্তু (মনে রেখ) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালভাবে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে (অপরের) চুপিসারে (পয়গম্বরের মজলিস থেকে) সরে যায়। অতএব যারা আল্লাহ্র আদেশের (যা রসূলের মাধ্যমে পৌঁছে) বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের ওপর (দুনিয়াতে) কোন বিপর্যয় পতিত হবে, অথবা (পরকালে, তাদেরকে কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে আযাব হওয়াও সম্ভব। আরও মনে রেখ, যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন এবং সেদিনকেও, যেদিন সবাই তাঁর কাছে পুনরুজ্জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দেবেন, যা তারা করেছিল। তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কিয়ামতের দিনই শুধু নয় আল্লাহ্ তা'আলা তো সব কিছুই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশেষভাবে রসূলে করীম (সা)-এর মজলিসের এবং সাধারণ সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে দুইটি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক. যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জিহাদ ইত্যাদির জন্য একত্রিত করেন, তখন ঈমানের দাবি হল একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে মজলিস ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত হয়ে যায়; কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে।

আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গাযওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। (কুরতুবী)

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই

চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাযহারী)

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরী মনে করতেন না। জওয়াব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয় নি; বরং কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান; যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

اَمْرٍ جَامِعٍ বলে কি বোঝানো হয়েছে ? ঃ এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বোঝানো হয়েছে, যার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরী মনে করেন; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল।

এই আদেশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক ? ফিকাহ্‌বিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এই বিধান, তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েয। (কুরতুবী, মাযহারী, বয়ানুল কোরআন) বলা বাহুল্য, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসের জন্য এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মুস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا—এর তফসীরের সার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা أضافت الى الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছাধীন, বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনা ধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دعاء الرسول--এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা أضافت الى المفعول)

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম দিয়ে 'ইয়া মোহাম্মদ' বলো না---এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রসূলুল্লাহ্' অথবা 'ইয়া নবী আল্লাহ্' বল। এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্দারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ---অর্থাৎ যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেমন লোকেরা পরস্পরে বলে। আরও একটি উদাহরণ: إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ---অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না, বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হুঁশিয়ারি: এই দ্বিতীয় তফসীরে বুযুর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত।

سورة الفرقان

সূরা আল-ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬ রুকূ, ৭৭ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ ﴿١﴾

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ

لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ﴿٢﴾

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ

وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ﴿٣﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে (৩) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান সেই সত্তা, যিনি ফয়সালার গ্রন্থ (অর্থাৎ কোরআন) তাঁর বিশেষ দাসের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বাস স্থাপন না করা অবস্থায় আল্লাহ্‌র আযাব থেকে সতর্ককারী হয়, তিনি

এমন সত্তা যাঁর রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কাউকে নিজের সন্তান সাব্যস্ত করেন নি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সবার পৃথক পৃথক প্রকৃতি রেখেছেন। কোনটির প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং কোনটির অন্য রকম। মুশরিকরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কোনক্রমেই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, তারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরা সৃষ্ট এবং নিজেদের কোন ক্ষতির অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোন উপকার (অর্জন) করার ক্ষমতা রাখে না। তারা কারও মৃত্যুর মালিক নয় অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রাণ বের করতে পারে না, কারও জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ কোন নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না এবং কাউকে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখে না। যারা এসব বিষয়ে সক্ষম নয়, তারা উপাস্য হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্য ঃ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে-আব্বাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। —(কুরতুবী) এই সূরার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

تَبَارَكَ—শব্দটি برکت থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। ইবনে-আব্বাস বলেন ঃ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। فُرْقَان—কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জিযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে ফুরকান বলা হয়।

لِلْعَالَمِينَ—এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

تَخْلِيق — فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا — تَخْلِيق-এর পর تَقْدِير উল্লেখ করা হয়েছে। تَخْلِيق -এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা---তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য ঃ تَقْدِير-এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয় নি যে, তার ওপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্তও করা হয় নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল; কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ্ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গাযযালী (র) এ বিষয়ে الحكمة فى مخلوقات الله تعالى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عبده খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্য এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

بندہ حسن بصد زبان گفت کے بندہ تو ام
تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ

عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا (৪) وَقَالُوْٓا

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا (৫)

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ

اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (৬) وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ

الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ

مَعَهٗ نَذِيْرًا (৭) اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ

مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (৮) اُنْظُرْ كَيْفَ

ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (৯)

(৪) কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের উপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শিখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপনভেদ অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ কেমন রসূল যা খাদ্য আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? (৮) অথবা তিনি ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? জালিমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (কোরআন সম্পর্কে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়, নিরেট মিথ্যা (ই মিথ্যা) যাকে তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর) উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকে (এই উদ্ভাবনে) তাঁকে সাহায্য করেছেন [এখানে সেসব গ্রন্থধারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এমনিতেই যাতায়াত করত।] অতএব (এ কথা বলে) তারা জুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে (এটা যে জুলুম

ও মিথ্যা, তা পরে বর্ণিত হবে)। তারা (কাফিররা এই আপত্তির সমর্থনে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) পুরাকালের উপকথা, যা তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর সুন্দর ভাষায় চিন্তা-ভাবনা করে করে সাহাবীদের হাতে) লিখিয়ে নিয়েছেন (যাতে সংরক্ষিত থাকে), এরপর তা-ই সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে পঠিত হয় (যাতে স্মরণ থাকে। এরপর মুখস্থ করা অংশ জনসমাবেশে বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া হয়।) আপনি (জওয়াবে) বলে দিন, একে তো সেই (পবিত্র) সত্তা অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব গোপন বিষয় জানেন। (জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এই কালামের অলৌকিকতা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, কাফিরদের এই আপত্তি ভ্রান্ত, মিথ্যা ও জুলুম। কেননা, কোরআন পুরাকালের উপকথা হলে কিংবা অপরের সাহায্যে রচিত হলে সমগ্র বিশ্ব এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে কেন অক্ষম হত?) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাই এ ধরনের মিথ্যা ও জুলুমের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না।) তারা [কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে] বলে, এ কেমন রসূল যে, (আমাদের মত) খাদ্য (ও) আহার করে এবং (জীবিকার ব্যবস্থার জন্য আমাদের মতই) হাটেবাজারে চলাফেরা করে। (উদ্দেশ্য এই যে, রসূল মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতা হওয়া উচিত যে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনের উর্ধ্বে।) কমপক্ষে এতটুকু তো হওয়া দরকার যে, রসূল স্বয়ং ফেরেশতা না হলে তার মুসাহিব ও উপদেষ্টা কোন ফেরেশতা হওয়া উচিত। (তাই তারা বলে) তার কাছে কেন একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হল না যে, তার সাথে তাকে (মানুষকে আযাব থেকে) সতর্ক করত অথবা (এটাও না হলে কমপক্ষে রসূলকে পানাহারের প্রয়োজন থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত, এভাবে যে) তাঁর কাছে (গায়েব থেকে) কোন ধনভাণ্ডার আসত অথবা তার কোন বাগান থাকত, যা থেকে আহার করত। (মুসলমানদেরকে) জালিমরা বলে, (যখন তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা নেই, ধনভাণ্ডার নেই এবং বাগান নেই; এরপরও সে নবুয়ত দাবি করে, তখন বোঝা যায় যে, তার বুদ্ধি নষ্ট। তাই) তোমরা তা একজন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পথে গমন করছ। (হে মোহাম্মদ) দেখুন, তারা আপনার কেমন অদ্ভুত উপমা বর্ণনা করে। অতএব তারা (এসব প্রলাপোক্তির কারণে) পথভ্রষ্ট হয়েছে, অতঃপর তারা পথ পেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মোহাম্মদ (সা) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরা-কালের উপকথা ইহুদী, খৃস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর—লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম।

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছেঃ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ—এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাযিলকারী আল্লাহ্ তা'আলার সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহ্র কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মুকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারও হয় নি। অথচ তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হল না। এটা এ বিষয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়াই এর অর্থ সম্ভার ও বিষয়-বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকবর্গ প্রথম খণ্ডে তা দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না; বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত ধনভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না. হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হত না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহ্র রসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি; প্রথম তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয় কোন ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি যাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বলগাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا

অর্থাৎ দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিস্তারিত জওয়াব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾ بَلْ
كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۣ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾
اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا ﴿١٢﴾
وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾
لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾ قُلْ
اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَآءً وَّ مَصِيْرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ۭ كَانَ
عَلٰي رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٦﴾ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ
ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٧﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ
مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى
نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ
فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿١٩﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ
اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ۭ وَجَعَلْنَا
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۭ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۧ

(১০) কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে

প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। (১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও চীৎকার। (১৩) যখন এক শিকলে তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না---অনেক মৃত্যুকে ডাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তা-ই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার প্রতিপালকের দায়িত্ব। (১৭) সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল? (১৮) তারা বলবে---আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বিরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (১৯) (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহ্গার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব। আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কিনা। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কাফিরদের ফরমায়েশের চাইতে) উত্তম বস্তু দিতে পারেন। (অর্থাৎ অনেক গায়েবী) বাগবাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় (উত্তম এ কারণে যে, তারা শুধু বাগবাগিচার ফরমায়েশ করত; যদিও তা একই হয়। একাধিক বাগান যে এক বাগানের চাইতে উত্তম তা বলাই বাহুল্য) এবং (বাগবাগিচার সাথে অন্য উপযুক্ত জিনিসও দিতে পারেন, যার ফরমায়েশ তারা করেনি; অর্থাৎ) দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ (যেগুলো বাগানেই নির্মিত কিংবা বাইরে। এতে তাদের ফরমায়েশ আরও অধিকতর নিয়ামতসহ পূর্ণ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, যা জান্নাতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তা দুনিয়াতেই আপনাকে দিতে পারেন, কিন্তু কতক রহস্যের কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি এবং মূলতঃ জরুরী ছিল না। অতএব সন্দেহ অনর্থক। তাদের সন্দেহের কারণ নিছক দুষ্টামি এবং সত্যের প্রতি অনীহা। এই অনীহা ও দুষ্টামির কারণ এই যে,) তারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করছে। (তাই পরিণামের চিন্তা নেই; যা মনে আসে করে এবং

বলে) এবং (তাদের পরিণাম হবে এই যে,) যারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে, আমি তাদের (শাস্তির) জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। (কেননা, কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করলে আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যা মনে করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা জাহান্নামে যাওয়ার আসল কারণ। জাহান্নামের অবস্থা এই যে,) সে (অর্থাৎ জাহান্নাম যখন দূর থেকে) তাদেরকে দেখবে, তখন (দেখামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে এমন গর্জন করে উঠবে যে) তারা (দূর থেকেই) তার গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। যখন তারা হস্তপদ শৃংখলিত অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে আহবান করবে (যেমন বিপদকালে স্বভাবতই মৃত্যুকে ডাকা হয় এবং মৃত্যু কামনা করা হয়। তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা এক মৃত্যুকে আহবান করো না; বরং অনেক মৃত্যুকে আহবান কর। (কারণ, মৃত্যুকে আহবান করার কারণ বিপদ। তোমাদের বিপদ অশেষ। প্রত্যেক বিপদই মৃত্যুর আহবান চায়। কাজেই আহবানও অনেক হবে। এখানে বিপদের আধিক্যকেই মৃত্যুর আধিক্য বলা হয়েছে) আপনি (তাদেরকে এই বিপদের কথা শুনিয়ে) বলুন, (বল) এই (বিপদের) অবস্থা ভাল (যা তোমাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে হয়েছে) না চিরকাল বসবাসের জান্নাত (ভাল), যার ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্-ভীরুদেরকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) দিয়েছেন? সেটা তাদের আনুগত্যের) প্রতিদান এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে যা চাইবে, তা পাবে (এবং) তারা (তথায়) চিরকাল থাকবে। (হে পয়গম্বর,) এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ করা (কৃপা হিসেবে) আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব এবং দরখাস্তযোগ্য। (বলা-বাহুল্য, চিরকাল বসবাসের জান্নাতই শ্রেষ্ঠ। অতএব আয়াতে ভীতি প্রদর্শনের পর ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।) আর (সেইদিন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন,) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে (যারা স্বেচ্ছায় কাউকে পথভ্রষ্ট করেনি তা মূর্তি হোক কিংবা ফেরেশতা প্রমুখ হোক) একত্রিত করবেন, অতঃপর (উপাসকদের লাঞ্ছনার জন্য উপাস্যদেরকে) বলা হবে, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে (সৎপথ থেকে) বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা (নিজেরাই) পথভ্রান্ত হয়েছিল? উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ইবাদত বাস্তবে পথভ্রষ্টতা ছিল। তারা এই ইবাদত তোমাদের আদেশ ও সম্মতিক্রমে করেছিল; যেমন তাদের ধারণা তাই ছিল যে, এই উপাস্যরা আমাদের ইবাদতে সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে, না তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি দ্বারা এটা উদ্ভাবন করেছিল?) তারা (উপাস্যরা) বলবে, আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করি? সেই মুরুব্বী আমরাই হই কিংবা অন্য কেউ হোক। অর্থাৎ আমরা যখন খোদায়ীকে আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, তখন আমরা শিরক করার আদেশ অথবা তাতে সম্মতি কিরূপে প্রকাশ করতে পারতাম? কিন্তু তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পথভ্রষ্টও এমন অযৌক্তিকভাবে হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতার কারণ-সমূহকে কুফরের কারণ করে দিয়েছে। সেমতে) আপনি তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে (খুব) ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। (তাদের উচিত নিয়মতদাতাকে চেনা ও তাঁর শোকর ও আনুগত্য করা; কিন্তু) তারা পরিণামে কুপ্রবৃত্তি ও আনন্দ-উল্লাসে

মেতে ওঠে) আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (জওয়াবে তারা একথাই বলল যে, তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা করেনি। আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের পথভ্রষ্টতাকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপাসনাকারীদেরকে জব্দ করার জন্য বলবেন এবং এটাই প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল,) তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদের কথা মিথ্যাই সাব্যস্ত করল, (ফলে তারাও তোমাদের সাহচর্য ত্যাগ করেছে এবং অপরাধ পুরাপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে)। অতএব (এখন) তোমরা (নিজেরাও শাস্তি) প্রতিরোধও করতে পারবে না এবং (অন্য কারও পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (এমন কি, যাদের ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল, তারাও পরিষ্কার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং তোমাদের বিরোধিতা করছে) তোমাদের মধ্যে যে জালিম (অর্থাৎ মুশরিক), আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদান করাব (যদিও তখন সম্বোধিতরা সবাই মুশরিক হবে; কিন্তু জুলুমের দাবী ও যে শাস্তি, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য বিধায় একথা বলা হয়েছে।) আপনার পূর্বে আমি যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়ত ও খানা খাওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেমতে যাদের নবুয়ত প্রমাণিত, আপত্তিকারীরা স্বীকার না করলেও তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধেও এই আপত্তি ভ্রান্ত। হে পয়গম্বর, হে পয়গম্বরের অনুসারীবৃন্দ, তোমরা কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হয়ো না। কেননা) আমি তোমাদের (সমষ্টির) এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। (এই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণকে উম্মতের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি যে, দেখা যাক, কে তাঁদের মানবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করত মিথ্যারোপ করে এবং কে তাদের নবুওয়তের গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করতঃ সত্যায়িত করে। যখন একথা জানা গেল, তখন) তোমরা কি (এখনও) সবর করবে? (অর্থাৎ সবর করা উচিত।) এবং (নিশ্চয়) আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন। (সেমতে প্রতিশ্রুত সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কাজেই আপনি দুঃখিত হবেন কেন?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং রহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে

বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মসনদে আহ্মদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরয করলাম ঃ না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব—এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত।—(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত ঃ দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিত্তশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফিরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহ্র রসূল মানব হতে পারে না—ফেরেশতাই রসূল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমরাও নবী ও রসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরা ও তো মানুষই ছিলেন; তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয় وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الْآيَةَ আয়াতে এই বিষয়ই বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের ওপর ভিত্তিশীল ঃ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সবকিছু করার শক্তি ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে

বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ন ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির ওপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমা অপেক্ষা বেশী কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিম্নস্তরের—যাতে তুমি হিংসার গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করতে পার।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾

(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশংকা করে না, (কেননা, তারা কিয়ামত ও তাতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া অস্বীকার করে,) তাঁরা (রিসালত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হল না কেন? (যদি ফেরেশতা এসে বলে যে, তিনি রসূল) অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে প্রত্যক্ষ করি (এবং তিনি নিজে আমাদেরকে বলে দেন যে, তিনি রসূল, তবে আমরা তাঁকে সত্য মনে করব। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) তারা নিজের অন্তরে নিজেদেরকে খুব বড় মনে করছে। (তাই তারা নিজেদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্বোধনের যোগ্য মনে করে। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলার ফরমায়েশে) তারা (মানবতার) সীমালংঘন করে অনেক দূর চলে গিয়েছে। (কেননা, ফেরশতা ও মানবের মধ্যে তো কোন কোন

বিষয়ে অভিন্নতা আছে; তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ও মানবের মধ্যে অভিন্নতা ও সামঞ্জস্য নেই। তারা আল্লাহ্‌কে দেখার যোগ্য তো নয়ই; কিন্তু ফেরেশতা একদিন তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। তবে যেভাবে তারা চায়, সেভাবে নয়; বরং তাদের আযাব, বিপদ ও পেরেশানী নিয়ে।) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, (সেদিন হবে কিয়ামতের দিন,) সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসতে দেখে অস্থির হয়ে) তারা বলবে, আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا শব্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। (কিতাবুল-আযদাদ ইবনুল-আম্বারী) এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সে-ই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির ওপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, সে ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলী সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

حِجْرًا مَّحْجُورًا--এর শাব্দিক অর্থ সুরক্ষিত স্থান। مَّحْجُورًا--এর তাকীদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয়ঃ আশ্রয় চাই; আশ্রয় চাই। অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামতের দিনেও যখন কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ حراما محرما বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জওয়াবে حِجْرًا مَّحْجُورًا বলবে। অর্থাৎ কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ।---(মাযহারী)

وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ
يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَٰمِ
وَنُزِّلَ الْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ
يَوْمًا عَلَى الْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ
يَٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا
خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ الشَّيْطَٰنُ
لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هَٰذَا
الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

(২৩) আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্‌র এবং কাফিরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৭) জালিম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে দাগা দেয়। (৩০) রসূল (সা) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সেদিন) তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সেসব (সৎ) কাজের প্রতি, যা তারা (দুনিয়াতে) করেছিল মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে (প্রকাশ্যভাবে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (অর্থাৎ ধূলিকণার ন্যায় নিষ্ফল) করে দেব। (বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা

যেমন কোন কাজে আসে না, তেমনিভাবে কাফিরদের কৃতকর্মের কোন সওয়াব হবে না। তবে) জান্নাতবাসীদের সেদিন আবাসস্থলও হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলও হবে মনোরম। (مستقر ও مقيل বলে জান্নাত বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ জান্নাত তাদের আবাসস্থল ও বিশ্রামস্থল হবে। এটা যে উত্তম, তা বলাই বাহুল্য।) যেদিন আকাশ মেঘমালা সহ বিদীর্ণ হবে এবং (সেই মেঘমালার সাথে আকাশ থেকে) প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা (পৃথিবীতে) নামানো হবে, (তখনই আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব নিকাশের জন্য বিরাজমান হবেন এবং) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহ্রই হবে। (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-শাস্তিদানের কাজে কারও প্রভাব খাটবে না; যেমন দুনিয়াতে বাহ্যিক ক্ষমতা অল্পবিস্তর অন্যের হাতেও থাকে।) সেদিন কাফিরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। (কেননা, জাহান্নামই তাদের হিসাব-নিকাশের পরিণতি।) এবং সেদিন জালিম (অর্থাৎ কাফির অত্যন্ত পরিতাপ সহকারে) আপন হস্তদ্বয় দংশন করবে (এবং) বলবে, হায়, যদি আমি রসূলের সাথে (ধর্মের) পথে থাকতাম। হায়, আমার দুর্ভোগ, (এরূপ করিনি।) যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! সে (হতভাগা) আমাকে উপদেশ আগমনের পর তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে (সরিয়ে দিয়েছে) শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসে। (সেমতে সে এই বিপদকালে কাফিরের কোন সাহায্য করেনি। করলেও অবশ্য কোন লাভ হত না। দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করাই তার কাজ ছিল।) এবং (সেদিন) রসূল (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে) বলবেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় কোরআনকে (যা অবশ্যপালনীয় ছিল) সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করে রেখেছিল। (আমল করা তো দূরের কথা, তারা এদিকে ভ্রূক্ষেপই করত না। উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নিজেরাও তাদের পথভ্রষ্টতা স্বীকার করবে এবং রসূলও সাক্ষ্য দেবেন; যেমন বলা হয়েছে وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا অপরাধ প্রমাণের এ দু'টি পন্থাই সর্বজনস্বীকৃত। স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য—এ দু'টি একত্রিত হওয়ার কারণে অপরাধ প্রমাণ আরও জোরদার হয়ে যাবে এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে) এমনিভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। (অর্থাৎ এরা যে, কোরআন অস্বীকার করে আপনার বিরোধিতায় মেতেছে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়, যার জন্য আপনি দুঃখ করবেন) এবং (যাকে হিদায়ত দান করার ইচ্ছা হয়, তাকে) হেদায়ত করার জন্য ও (হিদায়তবঞ্চিতদের মুকাবিলায় আপনাকে) সাহায্য করার জন্য আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مستقر — خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল।

مقيل শব্দটি قيلولة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مقيل-এর উল্লেখ সম্ভবত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিপ্রহরের সময় সৃষ্ট জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নাম-বাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।—(কুরতুবী)

تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ — এখানে بالغمام-এর অর্থ عن الغمام — অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ্ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا — এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনা এই ঃ ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে এলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ্ এক, ইবাদতের তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রসূল। ওকবা এই কলেমা উচ্চারণ করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হল। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কুরায়শ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ (সা) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হত। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল ঃ আমি তোমার এই ওযর কবূল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হল এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত হয়।—(বগভী) পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে

বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে ঃ হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!---(মাযহারী, কুরতুবী)

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে ঃ তফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল ; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فلانا (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মসনদে আহ্মদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لاتصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقى কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবূ হোরায়রার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المرء على دين خليله فلينظر من يخالل—প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।---(বুখারী)

হযরত ইবনে-আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন ঃ من ذكركم بالله رويته وزاد فى علمكم منطقه وذكركم بالاخرة عمله অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়।—(কুরতুবী)

—وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

অর্থাৎ রসূল মুহাম্মদ (সা) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্র দরবারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ——অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কোরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহ্‌র চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ ঃ কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফিরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين ان عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينه ـ

যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে; রীতিমত তিলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। কোরআন আল্লাহ্‌র দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।—(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

(৩২) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ হল না কেন? আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তঃকরণকে মজবুত করার জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা বলে, তাঁর (অর্থাৎ পয়গম্বরের) প্রতি কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ করা হল না কেন? (এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম হলে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল। এতে তো সন্দেহ হয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই চিন্তা করে করে অল্প অল্প রচনা করেন। এর জওয়াব এই যে,) এমনিভাবে

ভাবে (ক্রমে ক্রমে) এজন্য (অবতীর্ণ করেছি,) যাতে এর মাধ্যমে আমি আপনার হৃদয়কে মজবুত রাখি এবং (এজন্যই) আমি একে অল্প অল্প করে (তেইশ বছরে) নাযিল করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে কাফির ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাযিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। দ্বিতীয়, কাফিররা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্য কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কোরআন এক দফায় নাযিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা বাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরী ছিল না। তৃতীয়, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহ্র পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য আছে। তন্মধ্যে কতক সূরা বনী ইসরাঈলের, وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।—(বয়ানুল কোরআন)

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝٣٣ اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ
عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٣٤ وَلَقَدْ
اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝٣٥ فَقُلْنَا
اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝٣٦

(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই

পথভ্রষ্ট। (৩৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর সাথে তাঁর ভ্রাতা হারূনকে সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা আপনার কাছে যত অভিনব প্রশ্নই উপস্থাপিত করুক আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি (যাতে আপনি বিরোধীদেরকে উত্তর দেন। এটা বাহ্যত হৃদয় মজবুত করার বর্ণনা, যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য হচ্ছে আপনার অন্তর মজবুত করা। কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জওয়াব প্রদান করা হয়)। তারা এমন লোক, যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। তাদের স্থান নিকৃষ্ট এবং তারা তরিকার দিক দিয়েও অধিক পথভ্রষ্ট! (এ পর্যন্ত রিসালত অস্বীকার করার কারণে শাস্তিবাণী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এর সমর্থনে অতীত যুগের কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যাতে রিসালত অস্বীকারকারীদের পরিণতি ও বিস্ময়কর অবস্থা বিবৃত হয়েছে। এতেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য সান্ত্বনা ও হৃদয় মজবুত করার উপকরণ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর ওপর প্রবল করেছেন, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথম ঘটনা হযরত মূসা (আ)-র বর্ণনা করা হয়েছে যে,) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব (অর্থাৎ তওরাত) দিয়েছিলাম এবং (এর আগে) আমি তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারূনকে তাঁর সাহায্যকারী করেছিলাম। অতঃপর আমি (উভয়কে) বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে (হিদায়ত করার জন্য) যাও, যারা আমার (তাওহীদের) প্রমাণাদিকে মিথ্যারোপ করেছে (অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়। সেমতে তাঁরা সেখানে গেলেন এবং বোঝালেন; কিন্তু তারা মানল না)। অতঃপর আমি তাদেরকে (আযাব দ্বারা) সমূলে ধ্বংস করে দিলাম (অর্থাৎ সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিলাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا—এতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মূসা (আ)-র প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং আয়াতের অর্থ—হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে—এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ

করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। মিথ্যারোপ দ্বারা এসব ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে; যেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ—এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۚ
وَأَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَّعَادًا وَّثَمُودَا وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ
وَقُرُونًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثٰلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا
تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا
يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا
هُزُوًا ۚ أَهٰذَا الَّذِى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا
لَوْلَآ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ
أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰىهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ
وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا
كَالْأَنْعٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

(৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। জালিমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামূদ, কূপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের ওপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার ওপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা

করে না। (৪১) তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রসূল করে প্রেরণ করেছেন? (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে। তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নূহের সম্প্রদায়কেও (তাদের সময়ে) আমি ধ্বংস করেছি। তাদের ধ্বংস ও ধ্বংসের কারণ ছিল এরূপ) তারা যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে (প্লাবনে) নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাদের (ঘটনা)-কে করে দিলাম মানব জাতির জন্যে (শিক্ষার) নিদর্শনস্বরূপ। (এ হল দুনিয়ার শাস্তি) এবং (পরকালে আমি (এই) জালিমদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামূদ, কূপবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। আমি (তাদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকের (হিদায়তের) জন্যে অভিনব (অর্থাৎ কার্যকরী ও প্রাঞ্জল) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি এবং (যখন তারা মানল না, তখন) আমি সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা (কাফিররা সিরিয়ার সফরে) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল (প্রস্তরের) মন্দ বৃষ্টি (লূতের সম্প্রদায়ের জনপদ বোঝানো হয়েছে)। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? (এরপরও শিক্ষা গ্রহণ করে কুফর ও মিথ্যারোপ ত্যাগ করে না, যার কারণে লূতের সম্প্রদায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আসল কথা এই যে, শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ প্রত্যক্ষ না করা নয়;) বরং (আসল কারণ এই যে,) তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশংকাই রাখে না (অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই কুফরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না এবং পূর্ববর্তীদের বিপর্যয়কে কুফরের দুর্ভোগ মনে করে না; বরং আকস্মিক ঘটনা মনে করে)। যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে (এবং বলে:) এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রসূল করে প্রেরণ করেছেন? (অর্থাৎ এমন নিঃস্ব ব্যক্তির রসূল হওয়া ঠিক নয়। রিসালত বলে কোন কিছু থাকলে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির রসূল হওয়া উচিত। সুতরাং সে রসূলই নয়। তবে তার বর্ণনাভঙ্গি এত চিত্তাকর্ষক যে,) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে (শক্তরূপে) আঁকড়ে না থাকতাম। (অর্থাৎ আমরা হিদায়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডন করে বলেন, জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে পথপ্রাপ্ত এবং আমার পয়গম্বরকে পথভ্রষ্ট বলছে, মৃত্যুর পর) যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট ছিল,

(তারা নিজেরা না পয়গম্বর? এতে তাদের অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাঢ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ধনাঢ্য না হওয়ার কারণে নবুয়ত অস্বীকার করা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দুনিয়াতে মনে যা ইচ্ছা হয় করুক, পরকালে স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যাবে)। হে পয়গম্বর, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে তার উপাস্য করেছে তার প্রবৃত্তিকে? অতএব আপনি কি তার দায়িত্ব নিতে পারেন? অথবা কি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের হিদায়ত না পাওয়ার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন যে, তারা চাক বা না চাক, আপনি তাদেরকে সৎপথে আনবেনই। তাদের কাছ থেকে হিদায়ত আশাও করবেন না। কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বোঝেও না;) তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, (চতুষ্পদ জন্তু কথা শোনে না এবং বোঝেও না) বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট। (কারণ, চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয়; কাজেই তাদের না বোঝা নিন্দনীয় নয় কিন্তু তারা এর আওতাধীন। এরপরও তারা বোঝে না। এছাড়া চতুষ্পদ জন্তু ধর্মের জরুরী বিষয়সমূহে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়; কিন্তু তারা অবিশ্বাসী। আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ ও সন্দেহ নয়, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণই এর কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল।

أَصْحَابُ الرَّسِّ—অভিধানে رس শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ্ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামূদ গোত্রের অবশিষ্ট জন-সমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস করত।---(কামূস, দুররে মনসূর) তাদের শাস্তি কি ছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ্ হাদীসে বিবৃত হয়নি।---(বয়ানুল কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির

পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি'যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। —(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا
الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ
الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَ
أَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ
فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ
الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ ۛ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ

قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۝٦٠ تَبٰرَكَ الَّذِيْ
جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝٦١ وَهُوَ الَّذِيْ
جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٢

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে লম্বা করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তা দ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য

ও ঔজ্জ্বল্যময় চন্দ্র। (৬২) যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের) দিকে দেখনি যে, তিনি (যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দণ্ডায়মান বস্তুর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) বিস্তৃত করেন? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়।) তিনি ইচ্ছা করলে একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন (অর্থাৎ সূর্য ওপরে উঠলেও ছায়া হ্রাস পেত না এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌঁছে; কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক অবস্থায় রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি)। অতঃপর আমি সূর্যকে (অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়াকে) এর (অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার) ওপর (একটি বাহ্যিক) আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই যে, আলো ও ছায়া এবং এদের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার নিয়ন্ত্রক নয়; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে সৃষ্ট বিষয়সমূহের জন্যে কিছু বাহ্যিক কারণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই বাহ্যিক সম্পর্কের কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (অর্থাৎ সূর্য যতই ওপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঃশেষিত হতে থাকে। যেহেতু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহ্‌র কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র জ্ঞানে অদৃশ্য নয়, তাই "নিজের দিকে গুটিয়ে আনি" বলা হয়েছে।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং দিনকে (নিদ্রা মৃত্যুর মত এবং দিবা জাগ্রত হওয়ার সময়—এদিক দিয়ে যেন) জীবিত হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাস প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির আশা সঞ্চার করে অন্তরকে) আনন্দিত করে। আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষকে পান করাই। আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগিতা পরিমাণে) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে তারা চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন সর্বশক্তিমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য)। অতএব (চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা না করে রইল না। (এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কুফর ও শিরক। কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ করে অধিকাংশের অকৃতজ্ঞতা শুনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবেন না। আপনি একাই কাজ করে যান। কেননা, আপনাকে একা নবী করার উদ্দেশ্য আপনার পুরস্কার ও নৈকট্য বৃদ্ধি করা।) আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব